বিলেত বাসের অভিজ্ঞতা

রোশেনারা খান

বিলেত যাওয়ার সুযোগটা হঠাৎ -ই এসে গেল। কম - সম সময়ের জন্য নয়, একেবারে ছ'মাসের জন্য। রীতি অনুযায়ী মেয়ের প্রথম সন্তান বাপের বাড়িতে জন্মানোর কথা। কিন্তু তা সম্ভব নয় বলে মেয়ে জামাইয়ের আমন্ত্রণে ২০০৮ -এর ৮ মার্চ আমরা দু'জনেই বিলেত পাড়ি দিলাম।

জীবনে প্রথম বিমানে চড়ার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইংল্যান্ড পৌঁছে দেখলাম বিলেত দেশটা মাটির হলেও এ-মাটিতে কোনো আগাছা জন্মায় না, প্রায় প্রতিটি গাছেই সুন্দর ফুল ফোটে। মার্চ মাস থেকে এখানে গ্রীষ্ম শুরু। এই সময় থেকে বেলা বাড়তে শুরু করে। জুলাই মাসে অন্ধকার নামতে ১০টা বেজে যায়। সকালও হয় খুব তাড়াতাড়ি। এই কারণে মার্চের তৃতীয় রবিবার থেকে সময়টা ১ ঘন্টা এগিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই সময় ভারতীয় সময়ের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সময়ের ৪ ঘন্টা ৩০ মিনিটের পার্থক্য থাকে। অক্টোবরের তৃতীয় রবিবার থেকে আবার সময় ১ ঘন্টা পিছিয়ে যায়। তখন আমাদের দেশের সময়ের সঙ্গে এ-দেশের সময়ের ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিটের পার্থক্য হয়ে যায়। ২০০৭ -এ এই সময় পরিবর্তনের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। উইলিয়াম ইউলেট নামে এক সখের ঘোড় সওয়ারীর মাথা থেকে গীষ্মে সময় এগিয়ে নিয়ে আসার যুক্তিটির উদ্ভব হয়েছিল।

শীতে পাতা ঝরে যাওযা গাছগুলোতে মার্চের শেষ থেকে পাতা ও ফুল ফুটতে শুরু করে। পার্ক, বাগান বা বাড়ির লন এমনকি রাস্তার দুধার ফুলে ফুলে ঢেকে যায়। নটিংহাম-এর সিটি হাসপাতালের কোয়ার্টারে মেয়ে - জামাইয়ের ছোট্ট সংসার, কোয়ার্টারের পিছনের লনে নেড়া গাছগুলো সাদা ফুলে ঢেকে যেতে ভেবেছিলাম এগুলো বুঝি ফুলের গাছ। থাকতে থাকতে দেখলাম গাছগুলো নাসপাতিতে ভরে গেল। প্রাচীর ঘেরা লনের বাইরে ছোট ছোট নতুন গাছে আপেল ধরতে দেখলাম। দেখলাম চেরি ফলের গাছ।

এখানকার পরিবেশও স্বাস্থ্যকর এবং সুন্দর, কোনো ধরনেরই দূষণ নেই, লোডশেডিং নেই, রাস্তায় আমাদের দেশের মতো কুকুর - বিড়াল, গরু - মহিষ ঘুরে বেড়ায় না। কোনোরকম কোলাহল বা আওয়াজ নেই। এদেশের গাড়ির হর্ন বাজানো অভব্যতা। এখানকার যান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও আইন সাচ্ছন্দ্যদায়ক ও কঠোর। গাড়ির চালক নিয়ম মানছেন কিনা জানার জন্য রাস্তার ধারে গেটের মাথায় ক্যামেরা ফিট করা আছে। আইন লঙ্ঘন করলে লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। এদেশে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যতটা মুশকিল লাইসেন্স যাওয়াটা ততটাই সহজ। যাইহোক্ গাড়ির হর্ন শোনা গেলেও হাসপাতাল চত্বর বলে অ্যাম্বুলেন্স -এর তীব্র আওয়াজ মাঝে মাঝেই শোনা যায়। সকালে ঘুম ভাঙলে শোনা যায় নাম না জানা পাখির মিষ্টি ডাক।

পাখির প্রসঙ্গ যখন এসে গেল তখন এবিষয়ে দু-একটা কথা বলা যাক। এখানে কাক খুব কম চোখে পড়েছে। যত্র তত্র নোংরা পড়ে না থাকাই হয়তো এর কারণ। একানকার ঘুঘু পায়রা কাঠবিড়ালিরা আমাদের দেশের তুলনায় আকারে বেশ বড়। কাঠবিড়ালিগুলো নেউলের মতো, পায়রাগুলো হাঁসের মতো। তবে লন্ডনের টেমস্‌নদীর ধারে উড়ে বেড়ানো পায়রাগুলো খুব শুঁটকো। টেমস্ ছাড়াও ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড -এর বহু নদী লেক ও আটলান্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন ধরনের পাখি ও হাঁস দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। শেরউড জঙ্গলে কোনো হিংস্র জন্তু নেই। আছে বিরল প্রজাতির কীট -পতঙ্গ, কিছু নিরীহ জীবজন্তু ও অজস্র পাখি। জঙ্গলের পরিবেশে সেই সমস্ত নাম না-জানা পাখির কলতান ভোলার নয়।

এখানকার মানুষের শিষ্টাচার সৌজন্য দেখে একটা কথাই বার বার মনে হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে অনুকরণ করেও এদের ভালো গুণগুলি আজও আমরা রপ্ত করে উঠতে পারিনি বা পারার চেষ্টা করিনি। আমাদের দেশে অনেকেই সময় বিশেষে অতি পরিচিত মানুষদেরও না চেনার ভান করে এড়িয়ে যায়। এই গুনটি সাধারণত সমাজে অসাধারণ হিসাবে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। এখানে অপরিচিত জনেরাও দেখা হলে হ্যালো - হাই করেন। বিশেষ করে মহিলারা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাসি বিনিময় করতে ভোলেন না। সকালে রাস্তায় বের হলে শান্তিরক্ষক থেকে বাস চালক সকলের মুখ থেকেই গুডমর্নিং শোনা যায়। প্রতিটি যাত্রিও বাস থেকে নাবার সময় চালককে ধন্যবাদ জানান। এদেশের মানুষ খুব নিচুস্বরে কথা বলে। হাঁক - ডাক করে কথা বলতে খুব একটা শোনা যায় না। একদিন লন্ডন শহরের দ্রষ্টব্য স্থান এবং বস্তুগুলি দেখার জন্য একটি টুরিস্ট কোম্পানির ছাদ খোলা দোতলা বাসের একেবারে সামনের সিটের একদিকে আমরা দুজন অপর দিকে মেয়ে - জামাই বসেছে, মাঝখানে মেঝেতে ঝুড়ির মতো কারসিটে ঘুমিয়ে রয়েছে ৫৫ দিন বয়সের 'জারা'। আমার নাতনি। কোনো কারণে এক সময় ও তীব্রস্বরে কেঁদে ওঠে। সঙ্গের মহিলা গাইড ভাবেন তাঁর মাইক্রোফোনের আওয়াজে বাচ্চা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছে। ভদ্রমহিলা আমাদের কাছে এসে বারবার দুঃখপ্রকাশ করেন। এই রকম আরো অনেক ছোটছোট ঘটনায় এঁদের সূক্ষ্ম সৌজন্যতাবোধ দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

বিলেতে না এলে ধারণা করতে পারতাম না আমাদের দেশ, দেশের মানুষ কত গরীব। এর প্রধান কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা। এদেশে জনসংখ্যা কম, তুলনায় সম্পদ অনেক বেশি। এক সময় সমগ্র পৃথিবী শাসন করার সুবাদে এত ধন - সম্পত্তি সঞ্চয় করেছে যে জীবন ধারণের জন্য এদের সকলকে কাজ করে উপার্জন করতে হয় না। জমি থাকলেও এরা কৃষিতে তেমন আগ্রহী নয়। সবুজ প্রান্তরগুলির বেশিরভাগ অংশই পশুচারণ ভূমি। সারা পৃথিবী থেকে উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী এখানে আসে। ফসল ফলানোর প্রয়োজনও হয় না। নটিংহাম থেকে বিমানে আয়ারল্যান্ড -এর রাজধানী বেলফাস্ট যাওয়ার সময় নীচে তাকিয়ে হলুদ ক্ষেত দেখে সরষে ক্ষেত ভেবেছিলাম। পরে জানলাম ওগুলো রেপসীড ফুল। রেপসীড ছাড়া ও কোথাও কোথাও গম, আলু চাষও হতে দেখেছি। সিটি সেন্টারে বড় বড় সপিং মল -এর পাশে অস্থায়ী ছাউনির নীচে গ্রামের কৃষকদের সবজি ফল বিক্রি করতেও দেখা যায়।

এদেশের মহিলারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। নিজের দায়িত্ব নিজেই নিয়ে থাকে। কাজের ক্ষেত্রেও কোনো লিঙ্গ বৈষম্য নেই। মহিলারাও পুরুষের মতো সবধরনের কাজ করে থাকেন। মহিলা বাস চালক, মহিলা ডাকপিওন, হোটেল রেস্টুরেন্টে মহিলা খাবার পরিবেশনকারী আকছার চোখে পড়ে। সাধারণত সোম থেকে শুক্র এদের কাজের দিন,

শনি, রবি ছুটি। তবে পেশা অনুযায়ী কাজের সময় ও ছুটির তারতম্য ঘটে। আমাদের দেশে সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব মাকে নিতে হয়। তাই বহু চাকুরিরতা মাকে অভিযুক্ত করা হয় এই বলে যে তাদের সন্তানরা অযত্নে বড় হচ্ছে। এদেশের কিন্তু বহু মা চাকরি করেন বাবা বাড়িতে থেকে সংসার এবং বাচ্চা সামলান। আমাদের দেশের বাবারা বাচ্চার ন্যাপি বদলানো, তাকে দুধ খাওয়ানো ঘুম পাড়ানোর কথা ভাবতেই পারেন না। এগুলি তাঁদের কাছে মেয়েলি কাজ।

শহরের দু' -একটা মাল্টিপ্লেক্স বাদ দিয়ে বিকেল পাঁচটার পর সমস্ত দোকান - বাজার বন্ধ হয়ে যায়। কাচের দেওয়াল ভেদ করে থরে থরে সাজানো জিনিস দেখা যাচ্ছে কিন্তু কেনার উপায় নেই। এই সমস্ত দোকান বাজার রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এখানকার বিভিন্ন শহরের সপ্তাহে একদিন একটা বাজার বসতে দেখা যায়। এই বাজারে ক্রেতা - বিক্রেতাদের মধ্যে এশিয়ানদের বেশ প্রাধান্য রয়েছে। এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস বিক্রি হয়। ঠিক আমাদের দেশের হাটের মতো। ফল, সবজি, মাংস-ডিম, কেক, বিস্কুট। প্রসাধন সামগ্রী, গহনা, জামা - কাপড়, ব্যাগ জুতো সবই খোলা আকাশের নীচে বিক্রি হয়। এছাড়াও পুরাতন আসবাব বাসন পত্র, ঘরসাজাবার জিনিস, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম খুব সস্তায় বিক্রি হয়। জিপসীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুরাতন জিনিস কিনে বা হাতিয়ে নিয়ে এসে এই বাজারে বিক্রি করে। এদের কাছে মাত্র পঞ্চাশ পেনি (চল্লিশ টাকা) দিয়ে দুখান ছোট্টপ্লেট কিনেছি। অ্যান্টিক হিসেবে যার দাম কিছু হলেও আন্দাজ করা যায়। চিনেমাটির অপরূপ সুন্দর প্লেট দু'টির পিছনে লেখা রয়েছে এগুলি গ্রিসে তৈরি এবং কারুকার্যগুলি চব্বিশ ক্যারেট সোনার জলে আঁকা। হরেক মাল সাড়ে ছ'টাকার মত এই বাজারেও কোনো কোনো দোকানে সব জিনিসেরই একদাম। এছাড়াও সিটিসেন্টারের পাউন্ডল্যান্ড রয়েছে। এখানে সব জিনিসেরই দাম এক পাউন্ড। আমাদের দেশের মত এখানেও বছরের বিশেষ বিশেষ সময় বিভিন্ন জিনিসে ছাড় দেওয়া হয়। ছাব্বিশে ডিসেম্বর 'বকসিং'ডে। এই দিন প্রচুর সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রি হয়। মানুষ পাগলের মতো কেনেও।

শনি - রবি এদের কাছে আনন্দ উপভোগ করার দিন। শুক্রবার বিকেল থেকেই নাইট ক্লাব বার রেস্টুরেন্টগুলিতে ভিড় বাড়তে থাকে। যে কোয়ার্টারে রয়েছি তার সামনে একটা মস্ত বড় 'কারপাক'। কারপার্কের বাম দিকে বিশাল চিমনিওয়ালা লন্ড্রি। (এখানে হাসপাতালের সমস্ত কিছু ধোয়া হয়)। ডানদিকে একটা লিজার সেন্টার। শুক্রবার রাত্রি থেকে এখানে লোকসমাগম শুরু হয়। দিনের বেলা মিষ্টি রোদে বাচ্চাদের ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। শনি - রবিবারে দর্শনীয় স্থানগুলিতেও খুব ভিড় হয়। এবং বাচ্চার ব্যাপার হল কিছু কিছু স্থান অন্যান্য দিন অবাধ হলেও ছুটির দিনে টিকিট লাগে।

রবিবার এরা সকলেই গির্জায় যায় কিনা জানি না, তবে এদেশের হাসপাতাল ও বিমানবন্দরগুলিতে প্রেয়ার রুম রয়েছে। এখানে বসে যে - কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ তার নিজের মতো করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে পারে। এখানে আর একাট জিনিস দেখলাম, প্রত্যকটি হোটেলেই বিছানার পাশে ড্রায়ারের মধ্যে বাইবেল রাখা আছে।

সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত দেশ বলে এখানে কোনো ভিখারি নেই তা কিন্তু নয়, তবে এরা হাত পেতে ভিক্ষা চায় না। লাঙ্কাসায়ারের অন্তর্গত ব্ল্যাকপুল -এ প্লেডার সি বিচে বেড়ানোর সময় দেখলাম সমস্ত শরীরে রং মেখে স্ট্যাচু সেজে একজন ফুটপাতের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পায়ের কাছে একটা ঢাকনা খোলা বাক্স রাখা আছে। পথ চলতি মানুষেরা কেউ কেউ সেই বাক্সে পয়সা ফেলে যাচ্ছেন। শহরের সিটিসেন্টারেও গিটার বাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। নটিংহামের সিটি সেন্টারে গেলে প্রাইমার্ক -এর সামনে পোঁটলা পুঁটলি আর কুকুর সঙ্গে নিয়ে একটি জিপসি মহিলাকে একমনে বাঁশি বাজাতে দেখি। এই জিপসিদের সমাজের মূল স্রোতে শামিল করার বহু চেষ্টা করেছে বৃটিশ সরকার। ওদের বাড়ি দিতে চেয়েছে কাজ দিতে চেয়েছে। কিন্তু ওরা যাযাবর জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে রাজি হয়নি।

একসময় শুনেছিলাম এসব দেশে চোর - ডাকাত নেই। কারণ বিনা পরিশ্রমে খেতে পরতে পাওয়া গেলে মানুষ চুরি করার পরিশ্রম করবে কেন? কথাটা বহুলাংশে সত্য হলেও বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে এদেশেও চুরির প্রবণতা বাড়ছে। এর কারণ ড্রাগ। ড্রাগকেনার পয়সা জোগাড় করতে ছেলেরা গৃহস্থের বাড়িতে ছোটখাটো চুরি করছে। দীপকে (জামাই) ওর এক অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু একটা সাইকেল দিয়ে গিয়েছিল। সাইকেলটা কোয়ার্টারের বাইরে একটা পাইপের সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা থাকত। আমরা বহুবার ভিতরে রাখার কথা বলেছি, ওরা শোনেনি। খান সাহেব একদিন ভোরে দরজা খুলে দেখেন সাইকেল নেই। ওরাও আমরা আসার মাত্র কয়েকদিন আগে এই কোয়ার্টারে এসেছে। এই শহরে এসেছে একমাস মতো। তাই ওদের জানা ছিল না কিছুদিন আগে পাশের কোয়ার্টারের সকলে কয়েকদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে চোর পিছনের লনের বেড়া টপকে কাচের দরজা ভেঙে ল্যাপটপ ও আরো কিছু দামি জিনিস নিয়ে গেছে। আমরা থাকতে থাকতেই চুরি ঠেকাতে প্রতিটি কোয়ার্টারে এ্যালার্ম এবং সেন্সার লাইট লাগানো হল।

ইউরোপ - আমেরিকার হাইসোসাইটিতে ড্রাগের নেশা যে কতখানি সূক্ষ্মভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ঘটনাটি এখানে থাকাকালেই সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। দুটি তরুণ - তরুণী বাচ্চাদের নিয়ে বিবিসি টিভিতে দারুণ জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান করত। ছেলেটি খুবই প্রতিভাবান ছিল। একবার ও ওয়াসিং মেশিনের দোমড়ানো কাপড় দিয়ে খোলা মাঠের উপর একটা ছবি তৈরি করেছিল। হেলিকপ্টারে চড়ে আকাশ থেকে দেখে বোঝা গিয়েছিল ওটা জোকারের মুখের ছবি। এই রকমই মাঠের উপর ট্রাক্টার চালিয়ে এমন সব ছবি আঁকতো যা আকাশ থেকে দেখে তবেই বোঝা যেত। এই ছেলেটি ও মেয়েটির মধ্যে যে একটা গভীর ও মধুর সম্পর্ক রয়েছে তা ওদের আচার আচরণ দেখেই দর্শকরা বুঝে গিয়েছিলেন। ওরা একই বাড়িতে থাকত। সম্ভবত ওরা একে অপরের পার্টনার ছিল। যাইহোক হঠাৎ একদিন ছেলেটি ঘুম থেকে উঠে দেখে বাথ্টব উপছে গরমজল পড়ে সারা ঘর ভেসে যাচ্ছে এবং মেয়েটি বাথটবের গরম জলে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পুলিশ ছেলেটিকে অ্যারেস্ট করে। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা যায় মেয়েটি নিয়মিত কোকেন নিত। কয়েকদিন পরে ছেলেটি ছাড়া পাওয়ার পর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ওরও ড্রাগের নেশা ছিল। এই নেশাই প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটাল। ঘটনাটি এপ্রিল ২০০৮ এর। এদেশে শিশুর প্রতিটি বিষয়ে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। অথচ সেই শিশুদের এইরকম নেকড়েদের হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল।

এখানকার মানুষের সামাজিকতা বা লোকলৌকিকতা একেবারে ভিন্ন ধরনের। এখানে প্রায় দিনই এর ওর কোয়ার্টারে পার্টি হয় পটলাক্ পার্টি। পার্টিতে যত লোকই আমন্ত্রিত হন না কেন গৃহকর্তা বা কর্ত্রীকে সমস্ত খাবারের আয়োজন করতে হবে না। একটা কিছু রান্না করে রাখলেই হবে। কারণ প্রতিটি পরিবারই পটে করে কিছু না কিছু খাবার নিয়ে আসবেন না

কেন। খাবারও চলবে। সমস্ত খাবার টেবিলে সাজানো থাকবে। যাঁর যা খুশি তুলে নেবেন। আমরা যেমন কারো বাড়িতে গেলে মিষ্টি নিয়ে যাই বা কোনো খুশির খবরে অন্যদের মিষ্টি উপহার দি। এঁরা কারো বাড়িতে গেলে মদের বোতল এবং চকলেটের বাক্স নিয়ে যায়। মদের বোতল উপহার পেলে এরা ভীষণ খুশি হন। বন্ধুর আমন্ত্রণে পাব -এ গিয়ে নিজের পয়সাতে মদ খেতে হয়। এদেশে বিয়েতে ভুরিভোজ থাক বা না থাক উপহার দেওয়া নেওয়ার একটা মজার প্রথা রয়েছে। বিয়ের নিমন্ত্রন পত্রে লেখা থাকে— ''আমি উপহার হিসেবে আপনার কাছে অমুক জিনিসটি আশা করছি।'' কিম্বা লেখা থাকে, ''অমুক দোকানে আমার তালিকা দেওয়া আছে আপনি যে জিনিসটি উপহার দিতে চান তার তলায় দাগ দিয়ে দেবেন।'' এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ পত্র পাওয়ার পর হুড়োহুড়ি পড়ে যায় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। সকলেই চান সবার আগে দোকানে পৌঁছে কম দামের জিনিসটি বেছে নিতে। পার্টিতে গিয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে খাওয়া যেমন এদেশের রীতি তেমন ছোটদের পার্টিতে উভয় তরফ থেকে উপহার দেওয়া এবং নেওয়াও রীতি, আমাদের দেশে যা খুব একটা দেখা যায় না।

রান্না খাওয়া ছাড়া এখানে আমার আর বিশেষ কোনো কাজ নেই। রান্না করে মেয়ে জামাইকে খাওয়াতেও দারুণ উৎসাহ বোধ করছি। কারণ এমন সেরা উপকরণ দিয়ে রান্না করার সৌভাগ্য বা সুযোগ নিজের দেশে কোনো দিন হয়নি। মাছ মাংস, শাক - সবজি তেল মশলা সবই উৎকৃষ্টমানের। নটিংহাম আসার পূর্বে দীপের পোস্টিং ছিল কর্নওয়াল-এ। ওখানে কোথাও দু একটা সবজি ও সামুদ্রিক মাছ আর মাংস ছাড়া কিছুই তেমন পাওয়া যেত না। নটিংহামসায়ারের নটিংহাম, বার্মিংহাম, লিস্টার ইত্যাদি শহরে প্রচুর এশিয়ান বাস করে বিশেষ করে বাংলাদেশি ভারতীয় এবং পাকিস্তানিরা কেউ কেউ কয়েক পুরুষ ধরে এখানে জমিয়ে বাস করছেন। এঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক ভারতীয় ও পাকিস্তানি চিকিৎসক বা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। বাদবাকিরা হয় বিভিন্ন ব্যবসাতে চুক্ত নয় ট্যাক্সি ড্রাইভার। শুধু ইংল্যান্ড বা গ্রেট ব্রিটেনে নয় সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশিরা তাদের রেস্টুরেন্ট ব্যবসা ছড়িয়ে রেখেছে। ওরা ব্যবসা বলে না, বলে রেস্টরেন্ট শিল্প। আমাদের দেশে বৃটিশরা যখন রাজত্ব করত তখন শিলেটের কিছু লোক এদের কাছে বাবুর্চির কাজ করত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের কেউ কেউ বিলেতে চলে আসে এবং পরবর্তীকালে এই রেস্টরেন্ট ব্যবসা শুরু করে। তারপর থেকেই ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশি মানুষ এবং বিভিন্ন সামগ্রিক আমদানি এদেশে বেড়েই চেলেছে। ভিসার মেয়াদ ছ'মাস। অনেকে ভিসা ফুরিয়ে যাওয়ার পরও থেকে যায়। মাঝেমাঝেই রেস্টুরেন্টগুলিতে হানা দিয়ে বৃটিশ পুলিশ তাদের ধরে ধরে দেশে ফেরৎ পাঠায়। বাংলাদেশিরাও কম যায় না—এরাও ভিসা আইন পরিবর্তনের দাবিতে মাঝে মধ্যেই দলবেঁধে প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছে। কিন্তু এদেশের আইন- কানুন খুবই নির্মম। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা জানাই। ঘানার একটি মেয়ে স্টুডেন্ট- ভিসা নিয়ে কার্ডিফ ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসেছিল। পড়া শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়েটি কিডনির অসুখে আক্রান্ত হয়ে কার্ডিফের হাসপাতালে ভর্তি হয়। চিকিৎসা চলা কালে মেয়েটির ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং তাকে ঘানা ফিরে যেতে বলা হয়। ঘানা খুবই দরিদ্র দেশ, সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থাও এত উন্নত নয়। তাই মেয়েটি বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানায় তাকে যেন চিকিৎসার জন্য আরো কিছুদিন এদেশে থাকতে দেওয়া হয়। দেশে ফিরে গেলে সে মারা যাবে। বৃটিশ সরকার তার আবেদন খারিজ করে দিয়ে বিশেষ বিমান পাঠিয়ে তাকে কার্ডিফ্ থেকে হিথরো এবং হিথরো থেকে ঘানা পাঠিয়ে দেয়। এর মাস দুই পরেই মেয়েটি মারা যায়। সংবাদপত্র থেকে এই ঘটনাটি জানার পর একটা কথাই মনে হয়েছে এদেশের আইনী ব্যবস্থায় মানবিকতার কোনো ঠাঁই নেই। মেয়েটিকে দেশে ফেরৎ পাঠানোর জন্য বৃটিশ সরকার বিমান যাত্রায় এত খরচ করল অথচ কিছু দিনের জন্য অসুস্থ মেয়েটি হাসপাতালে একটি বেড পেলে হয়তো বেঁচে যেত। তাই মনে হয় না বাংলাদেশিদের দাবি বৃটিশ সরকার সহজে মানবে। ইউরোপের বাইরে থেকে যাঁরা এখানে চাকরি করতে এসেছেন বৃটিশ সরকার তাঁদেরও ভিসা বাড়ানোর এবং নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে দিনে দিনে নীতি নিয়ম আরো কঠোর করছে।

যাইহোক্ লিস্টারে শিখ এবং বার্মিংহামে বাঙালিদের বাস বেশি। বার্মিংহামে বাঙালিরা (বাংলাদেশি)১লা বৈশাখ উপলক্ষে বৈশাখ মাসে বিরাট বৈশাখী মেলার আয়োজন করে। নটিংহামে পাকিস্তানিদের আধিক্য বেশি। মদিনা, হাফিজ ইত্যাদি এদের ম্যাল্টিস্টোর গুলিতে পছন্দ মতো সবই পাওয়া যায়। রুই, ইলিশ, পাবদা, পুঁটি, মৌরলা, ট্যাংরা, শোল, কই, তেলাপিয়া ও বিভিন্ন সাইজের চিংড়ি ছাড়াও নানা ধরনের মাছ এবং খাসি মুরগি ও ভেড়ার মাংস পাওয়া যায়। সরষে, পালং ও মেথি ছাড়া আর কোনো শাক দেখিনি। তবে আমাদের দেশের প্রায় সব সবজিই পাওয়া যায়। লাউ, পটল, ঝিঙে, কুমড়ো, করলা, কচু, মুলো, সজনে ডাঁটা, রাঙা আলু, কাঁচকলা, ঢাঁড়স, বরফে জমানো একসঙ্গে প্যাকেট - বন্দি কচুর লতি টুকরো করে কাটা। খোসা ছাড়ানো ছোট চিংড়ি ও কাঁঠাল বিচি (বরফে জমানো) সবই পাওয়া যায়। এখানে দুটো নতুন সবজি রান্না করলাম। একটার নাম জুগিনি, দেখতে শশার মত কিন্তু বোঁটা এবং খোসা কাঁচা কুমড়োর মতো, সবজিগুলো এত কাটতে বিচি গুলো কেমন চেনা যায় না। আর একটা সবজী দেখতে বাঁধা কপির মত কিন্তু সাইজে আমড়ার মতো, খোঁজ নিয়ে জানলাম একটা মুশলের মতো দণ্ডের গায়ে সবজিগুলো ফলে থাকে। নাম হল রাসেল - স্প্রাউটি। পাঁচফোড়ন - আদা-জিরে দিয়ে রান্না করতে বাঁধাকপির মতই স্বাদ পেলাম। বেশিকিছু অচেনা ফলও খেলাম এখানে। সবেদার মতো দেখতে কিউই ফলের গায়ে সামান্য রোঁয়া রয়েছে, ভিতরটা সসার মতো স্বাদ, সামান্য টক্, নুন ছড়িয়ে খেতে ভালোই লাগে। এখানকার আলু পেঁয়াজ সবই খুব বড় সাইজের। ছোট আলুকে এরা 'বেবি পটেটো' বলে শশাও খুব লম্বা, অনেকটা চিচিঙ্গার মতো এবং দুই দিক ছুঁচোলো। পাকিস্তানি মাল্টিস্টোরগুলোতে সবরকম ভালো মশলা এমনকী চিঁড়ে মুড়িও পাওয়া যায়। বাসমতীচাল ডাল, মশলা ইত্যাদি আসে পাকিস্তান থেকে সবজী মাছ ইত্যাদি আসে বাংলাদেশ থেকে। এখানে বাংলাদেশিদের নিজস্ব ব্রান্ড-এর বহু জিনিস তৈরি হয়। যেমন বরফে জমানো রুটি, পরোটা, ডালপুরি আরো অনেক কিছু। অন্তত এই শহরে ভারত থেকে আমদানি হওয়া জিনিস খুব একটা চোকে পড়ে না। তবে হলদিরামের শনপাপড়ি ও সিঙ্গারা পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় গুজরাটি রুটি থ্যাপলা। একটা কথা বলা হয়নি, মেয়ে একদিন শ্যামন মাছ রান্না করেছিল। খেতে তেমন ভালো লাগেনি।

এদেশের মানুষ আমাদের মতো রান্নার পিছনে এত সময় নষ্ট করে না। টিন এবং প্যাকেটবন্দি নানারকম রান্না করা খাবার পাওয়া যায়। সেই খাবার মাইক্রোওয়েব ওভেনে গরম করে নিলে বা গরম জল মিশিয়ে নিলেই খাওয়া যায়। কিছু খাবার সেঁকে নিলেই চলে। বাড়িতেই খাবার খেতে হবে এমন কোনো মানে নেই। ম্যাকডোনাল্ড-এর মতো আন্তর্জাতিক

মানের বহু রেস্টুরেন্ট রয়েছে এবং পয়সারও অভাব নেই। এই প্রসঙ্গে জানাই এই সমস্ত রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে দেখেছি এরা খাবারের সঙ্গে জলের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের পানীয় অথবা ফলের রস পান করেন। এরা নুন এবং মিষ্টি খুব কম খায়, ঝাল খায়ই না। তাই এদের খাবারে নুন থাকে না মিশিয়ে খেতে হয়। দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ফল ইত্যাদি প্রতিটি জিনিসের এদের এক্সপায়ারিডেট্ লেখা থাকে। এরা সবদেশের খাবারই পছন্দ করে এমনকী আমাদের মশলাদার খাবারও। পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টগুলিতে এদের উপস্থিতি দেখলেই তা বোঝা যায়। এখানে একটা কথা জানানো দরকার, বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টগুলি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট নামে পরিচিত। লন্ডন থেকে এনভারনেস্ সর্বত্র এমনটাই দেখলাম। বাংলাদেশের বাঙালিদের সম্বন্ধে আর একটা কথা না বললেই নয়। এরা শুধু ভারতীয় বা বাঙালি খানাকেই এখানে প্রসিদ্ধ করেনি এদেশে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বও এরাই করে থাকে। এখান থেকে প্রচুর বাংলা পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এরা বেশ ঘটা করেই রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী পালন করে। ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইটালি, জার্মানি ইত্যাদি ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় এরা বৈশাখী মেলার আয়োজন করে। এই তো সেদিন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী লন্ডনে একটি লাইব্রেরির উদ্‌বোধন করল। ওদের নিজস্ব স্কুল আছে সেখানে বাংলা পড়ানো হয়।

এদের পোশাকে রংয়ের বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায় না। নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সকলকেই ধূসর সাদা নীল কালো ইত্যাদি অনুজ্জ্বল রংয়ের পোশাক পরতে দেখা যায়। বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে স্কার্ট পরার প্রবণতা বেশি। এরা হাঁটুর উপর পর্যন্ত ত্বকের রংয়ের চাপা মোজা পরেন। অল্প বয়সি মেয়েরা নিম্নাঙ্গে ছেঁড়া ফাটা জিনস্ পরে এবং উর্ধ্বাঙ্গের বেশির ভাগ অংশ খোলা রাখে। তবে অতিরিক্ত ঠান্ডা হলে শীতের পোশাক পরতেই হয়। শিশুদের পোশাকে রংয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মেয়েদের জামা, টুপি, মোজা , জুতো, বিছানা, কম্বল, ব্যাগ ইত্যাদি সব কিছুই গোলাপি রংয়ের এবং ছেলেদের সবই নীল বা আকাশি রংয়ের। তাই পোশাক দেখেই চেনা যায় শিশুটি ছেলে না মেয়ে।

নিজেদের পোশাকে রংয়ের বৈচিত্র্য না থাকলেও এরা যেন রঙিন পোশাকও পছন্দ করে তা টের পাই যখন ওরা আমাদের শাড়ির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। টিউব - রেলে, হোটেলে, রেস্টরেন্টে, সপিংমলে মাঝে মধ্যেই মেমসাহেবদের কাছে আমাদের পোশাকের (শাড়ি) প্রশংসা শুনতে পাই। স্কটল্যান্ড বেড়াতে গিয়ে ঢাকাই, বালুচরী, জারদোসী, সিফন্ ইত্যাদি রোজ এক এক রকম শাড়ি পরতাম। একদিন একটি লেকের ধারে আমাদের টুরিস্ট বাসের ড্রাইভার বিল্ এবং গাইড টনি আমাকে ঘিরে ধরে জানতে চাইলেন, আমি রোজ এত সুন্দর সুন্দর পোশাক পরি, এরকম সুন্দর পোশাক কতগুলো নিয়ে এসেছি। এমনকি টুরিস্টরাও প্রত্যেক দিন সকালে হোটেল থেকে বের হয়ে বাসে চড়ার সময় কৌতূহল ভরে লক্ষ্য করতেন আমি কী পরেছি, কেমন সেজেছি। ব্যাপারটাতে খুব মজা পেয়েছিলাম, বঙ্গনারী হিসেবে গর্বও অনুভব করেছিলাম। মেমসাহেবরা প্রায় প্রত্যেকেই ঠোঁটে লিপস্টিক আর চোখে মাসকারা ব্যবহার করেন। আর একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমাদের দেশে যেমন রং ফর্সা করার জন্য হরেক রকম ক্রিম এবং লোসন বিক্রি হয়, তেমন এদেশে ত্বকের রং বাদামি করার জন্য ক্রিম লোসন বিক্রি হয়। এখন আর এরা কালো মানুষ দেখে নাক সিটকায় বলে মনে হয় না। কারণ রাস্তায় বের হলেই সাদা কালো দম্পতি বা পার্টনার চোখে পড়ে। কালো পুরুষের সাদা সঙ্গিনী-সাদা পুরুষের কালো সঙ্গিনী দুই -ই দেখা যায়। এদের ছেলে মেয়েরা বাবা অথবা মা কারো একার মতো দেখতে হয় না। ছেলে বা মেয়েটির গায়ের রং হয়তো খুব ফর্সা মুখের গঠন এবং চুল নিগ্রোদের মতো। আবার উল্টোটাও হয়।

এদেশের মানুষ সাম্যবাদে বিশ্বাসী। তাই শহরের এক একটি পাড়া বা এলাকার সমস্ত বাড়ি একই উচ্চতার এবং একই রকম দেখতে। ইচ্ছে গেলেও কেউ অন্য রকম করতে পারবে না। অন্যদের গাড়ি যদি ফুটপাতে থাকে তবে জায়গা থাকলেও কেউ গ্যারেজ বানাতে পারবেনা। তাঁকেও ফুটপাতে গাড়ি রাখতে হবে। প্রসঙ্গত জানাই এদেশে অনেকের গাড়িই বাড়ির সামনে খোলা আকাশের নীচে রাখা থাকে। একসময় আগুন জ্বেলে ঘর গরম করা হত। এখন বিদ্যুতের সাহায্যে ঘর গরম রাখা হয়। তবুও বাড়ির মাথায় আজও ফায়ারপ্লেসের চিমনি গুলি শোভা পাচ্ছে। কারণ এঁরা অতীতের চিহ্ন স্মারক হিসেবে রাখতে ভালোবাসেন। এই চিমনিওয়ালা বাড়িগুলির চাহিদাও বেশি। চিমনির মতো আর একটা জিনিস কিছু কিছু বাড়িতে দেখা যায়। যখন রেফ্রিজারেটার আবিষ্কার হয়নি তখন কাঁচা মাংস সংরক্ষনের জন্য বাড়ির বাইরের দিকের একটা কোনায় ইট কাঠের পরিবর্তে তারের জাল লাগানো হত। ভিতরের দিকে একটা কাঠের পাল্লা থাকত। প্রচন্ড ঠান্ডায় তারের জালে বরফ জমে দেওয়াল তৈরি করত তখন পাল্লা খুলে ঐ কোনার মধ্যে কাঁচা মাংস মজুত করে রাখা হত।

এদেশে চিকিৎসা পরিসেবা ফ্রি-তে পাওয়া যায়। ডাক্তার দেখাতে কোনো ফি লাগে না। শিশু (১৬ বছর বয়স পর্যন্ত) গর্ভবতী মহিলা ও ষাট উত্তীর্ণ নারী পুরুষেরা ফ্রি-তে ওষুদ ও পেয়ে থাকেন। প্রেসক্রিপশন নিয়ে ফার্মাসিস্টের কাছে গেলেই বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া যায়। এদের সমস্ত ওষুধের একদাম। প্রত্যেক পাড়ায় একজন করে জিপি (জেনারেল ফিজিশিয়ান) রয়েছেন। অসুস্থ হলে প্রথমে তাঁর কাছেই যেতে হয়। প্রয়োজন মনে করলে তিনিই রোগীকে হাসপাতালে পাঠান, ক্রমিক নং অনুযায়ী হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ পাওয়া যায়। এই সুযোগ পাওয়ার জন্য রোগীকে এক দুমাস অপেক্ষা করতে হতে পারে। তবে ইমার্জিন্সি কেস থাকলে আলাদা ব্যাপার।

আগেই শুনেছিলাম এখানে একজন মন্ত্রীকেও চিকিৎসার জন্য লাইনে অপেক্ষা করতে হয়। বিশিষ্ট কেউ হলেই তাঁকে বিশেষ সুযোগ দিতে হবে আমাদের দেশের মতো এমন দাদাগিরি এখানে চলে না। কথাটা যে কতখানি সত্য তা মেয়ের সন্তান প্রসবের সময় উপলব্ধি করলাম। এখানকার নিয়ম অনুযায়ী মেয়ে প্রথমে জিপির কাছে নাম নথিভুক্ত করে। প্রতিমাসে এখানেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায়। প্রসবকাল আসন্ন হলে জিপি ওকে হাসপাতালে পাঠান। আমাদের দেশের মতো এখানে যথেচ্ছ ভাবে অস্ত্রোপচার করে সন্তান প্রসব করানোর হয় না। কিন্তু আমার মেয়ে সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কায় স্বাভাবিক প্রসব চাইছিল না, ভয় পাচ্ছিল। হাসপাতালের আউটডোরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় ও ওর আশঙ্কার কথা চিকিৎসককে জানালে তিনি মায়ের মনের অবস্থার কথা বিবেচনা করে অস্ত্রোপচার করতে রাজি হন। দীপ এই হাসপাতালেই চিকিৎসক। অস্ত্রোপচারের আগের দিন ওর নাইট ডিউটি ছিল। তাই আমরা দুজনে মেয়েকে নিয়ে নির্ধারিত দিনে সকাল আটটার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছালাম। ১০টায় ওকে ওটিতে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। বিকেল ৪টে পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শুধু এই হাসপাতালের নয় এই প্রসূতি বিভাগের একজন চিকিৎসকের স্ত্রী হিসেবে আমার মেয়ে কিন্তু আগে সুযোগ পায়নি। ওর শারীরিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। তাই দুটি ইমার্জেন্সি কেস এসে যাওয়াতে তাদের

আগে ওটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সেদিন হাসপাতালে সারাদিনের অপেক্ষা আমার অন্তত বিফলে যায়নি। দীপের কছে এদেশের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের অসহায়তার নানা কাহিনী শুনি। দীর্ঘায়ু বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের শেষ জীবনটা এখানে চরম একাকিত্বের মধ্যে কাটে। সচরাচর এরা অন্যের সাহায্যে নিতে চান না, আগে বাড়িয়ে কেউ সাহায্য করতে এলে বিরক্ত হন। নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়। চলৎশক্তি তেমন না থাকলে হুইল চেয়ারে চড়েই দোকান বাজার হাসপাতাল সর্বত্র চলাফেরা করেন (এদেশে বাসে - ট্রেনে হুইল চেয়ার ও বাচ্চাদের প্যারাম্বুলেটর নিয়ে চড়া যায়। শেষ জীবন পর্যন্ত যারা গাড়ি রাখতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা গাড়ি ব্যবহার করেন। ইংল্যান্ডের জীবনযাত্রা পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল বলে শোনা যায়। তাই সাধারণ মানুষ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিশেষ টাকা পয়সা রাখতে পারেন না। বাড়ি গাড়ি সবই প্রায় বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। তাছাড়া সরকারি ভাতা পান যাঁরা তাঁদের নিজস্ব বলে কিছু থাকে না। প্রয়োজনের তুলনায় বড় বাড়ি থাকলে সরকার নিয়ে নেয় এবং তাঁকে বা তাঁদের ছোট বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে। অনেক নিজে বাড়ি ছাড়তে রাজি হন না। তখন ভাতা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে অর্থের অভাবে তাঁদের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে দাঁড়ায়। গর গরম রাখার জন্য হিটিং মেসিন চালাতে পারেন না, ঠান্ডা থেকে বাঁচতে আগুন জ্বেলে কিম্বা গরম জলে সেঁক নিতে বাধ্য হন, রক্তে অতিরিক্ত শর্করা থাকার কারণে শরীরের কিছু কিছু অংশ অসাড় হয়ে যায়। পুড়ে গেলেও টের পান না। একদিন দগদগে ঘা নিয়ে তাঁরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসেন। দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসা কোনো কোনো অথর্ব মানুষকে তাঁর পোষা কুকুর পথ দেখিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসে। সারাদিন হাসপাতালে অপেক্ষা করে এই সব মানুষদেরই দেখলাম। কেউ মোটরচালিত চেয়ারে বসে একাই এসেছেন কারো বা স্বামী অথবা স্ত্রী চেয়ার ঠেলে নিয়ে এসেছেন। একেবারে অর্থব, অসুস্থ ঝুঁকেপড়া মানুষগুলোকে দেখে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। এঁদের আত্মীয় পরিজন ছেলে মেয়েরা কোথায় কে জানে!

বয়স্করা ছাড়াও 'লো ইনকাম' যাঁদের কিম্বা যাঁদের কোন 'ইনকাম' নেই তাঁদের সন্তানেরা সরকারি ভাতা পায়। শারীরিক বা সাংসারিক অসুবিধার (বৃদ্ধ বাবা - মায়ের বা সন্তানদের দেখাশোনা করা) কারণে যাঁরা কাজ করতে পারেন না সরকার তাঁদেরও ভাতা এবং থাকার জন্য বাড়ি দেয়। যত বেশি সদস্য সংখ্যা তত বড় বাড়ি পাওয়া যায়।

এক কথা এদেশের নাগরিক পরিসেবা অনবদ্য। তবে নাগরিক জীবন বড্ড বেশি এলো মেলো অবিন্যস্ত। পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন তেমন সুদৃঢ় নয়। সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু প্রেম প্রীতি, স্নেহ-মমতার গভীরতা বা স্থায়ীত্ব নেই। পশ্চিমের দেশগুলিতে বিয়ে ব্যাপারটা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে লিভটুগেদার। একত্রে বাসকারী নারী পুরুষ দুটি একে অপরের পার্টনার। এই সম্পর্কে আইন এবং সমাজ স্বীকৃত। হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের দরজার পাশে লেখা রয়েছে একমাত্র পার্টনার যে-কোনো সময় ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন। ভালোলাগা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের জায়গা থেকে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বয়সের সামঞ্জস্য থাকার প্রয়োজন হয়না। হাসপাতালে বয়স্ক পুরুষের তরুনী পার্টনার দেখে আমি তো প্রথমে বাবা মেয়ে ভেবেছিলাম। বয়স্ক মহিলার তরুন পার্টনারও দেখেছি। নারী পুরুষের এই সম্পর্কের মধ্যে অনেকটাই ফাঁক বা জায়গা থাকে। ইচ্ছে করলে এরা কিছু দিনের জন্য অপর কোনো নারী বা পুরুষের সঙ্গে কাটিয়ে আবার পুরোনো সংসারে ফিরে আসতে পারে। এ-ব্যাপারে কারো কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি থাকে না। এদেশের সন্তানের পিতৃ পরিচয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। একজন মায়ের ৭টি সন্তানের বাবা সাত জন পুরুষ হতে পারে। সন্তানের ভরণ - পোষণের দায়িত্ব তো সরকারের। তাই এই যথেচ্ছাচার সম্ভব হয়। এই ধরনের পরিবারের বাবা মায়েরা সাধারণত কেউ কোনো কাজ বা উপার্জন করে না। এদের কাছে অধিক সন্তান খুবই লাভজনক। বেশি সন্তান মানে ভাতার টাকার পরিমানও বেশি। সেই টাকাতে বাবা মাও আরামে জীবন কাটাতে পারে। এদের সমাজে ব্যক্তি - স্বাধীনতা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বাবা মাও প্রয়োজনে নিজের নাবালক সন্তানদের শাসন করতে পারে না। সন্তান নালিশ জানালে (এখানে ৯৯৯-এ ফোন করলে যে কোনো ধরনের সাহায্য পাওয়া যায়) বাবা মার শাস্তি হতে পারে। লাগাম ছাড়া এই স্বাধীনতা বর্তমান প্রজন্মকে একেবারে উচ্ছন্নে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলে মেয়েরা নানা রকম নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। ১৩/১৪ বছরের মেয়েরা পুতুল বুকে নিয়ে হাসপাতালে গর্ভনিরোধক বড়ি চাইতে এমনকী গর্ভপাত করাতে আসে। মেয়েটি যদি তার গর্ভপাতের বিষয়ে বাবা মাকে কিছু না জানাতে চায় তবে ডাক্তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে বাধ্য। তা না হলে ডাক্তারের শাস্তি হতে পারে। এদের উপর আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের মত পড়াশোনার তেমন চাপ নেই। সরকারি স্কুলগুলি অবৈতনিক, তবে প্রাইভেট স্কুলে নার্শারি ক্লাসে মাসিক পড়ার খরচ ১০০০ পাউন্ডের মতো। কলেজ, ইউনিভারসিটির পড়ার খরচও খুব বেশি। এই খরচের জন্য ছেলে মেয়েরা মা বাবার কাছে লোন নিতে পারে। এই সমস্ত অদ্ভুতুড়ে কান্ড এখানকার সমাজে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই দেশটার যতটুকু দেখেছি যতটুকু জেনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে স্বর্গ এখানেই, আমার একমাত্র পুণ্যবানেরা এই স্বর্গে বাস করার সুযোগ পায়। তবে অল্প সময়ের জন্য এই স্বর্গে বেড়াতে এসে মাঝে মধ্যেই আমার মাতৃভূমির জন্য ভীষণ মন খারাপ হয়। মন খারাপ হয় বন্ধু আত্মীয় এমনকী ঝগড়ুটে ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশীর জন্যও। ঘেটু ফুল, হলুদ পাখি, শিয়ালকুলের ঝোপ, পানাপুকুর, মেঠোরাস্তা সব কিছুর জন্যই মন খারাপ হয়। জন্মভূমির প্রতি এই নিবিড় ভালোবাসা এই দূর দেশে না এলে কোনো দিন উপলব্ধিই করতে পারতাম না। বোধ হয় একেই বলে নাড়ির টান।